কফি House ১
সংবাদ প্রতিদিন ১০ মার্চ ২০১৮ শনিবার
কফি House
১০
১৪৭ সংখ্যা, পছন্দের ২০ ৯
১০

সেই তো প্রথম

সমরেশ ৭৫

ছবি: সুব্রত কুমার মণ্ডল

অদ্ভুত সমাপতন। কফিহাউস-এর প্রথম জন্মদিন আবার তাঁর সেভেন্টি ফিফ্‌থ বার্থডে। তিনি সমরেশ মজুমদার আজ প্ল্যাটিনাম জুবিলির দিনে জমিয়ে আড্ডায় বসেছেন শঙ্করলাল ভট্টাচার্য-র সঙ্গে

বেলা বয়ে যায়। কালজয়ী 'কালবেলা'-র লেখক সমরেশ মজুমদারেরও পা পড়ল পঁচাত্তরে।

আজ, ১০ মার্চ, ২০১৮-য়।

এখনও মনে হয়, এই তো সে দিন এক সিনেমাপত্রের পুজোসংখ্যায় কী রকম ভীরু পদক্ষেপে ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজেকে জানান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এক ঝাঁকড়াচুলো, ঝকঝকে তরুণ। সালটা ১৯৭৭, উপন্যাসটা 'এই আমি রেণু'।

তাতে কতটা কী জানান দেওয়া গেল জানা যায় না। সমরেশ বসু ছাড়াও যে একটা সমরেশ লেখালিখি করে সেটা ধরতে আর একটু অপেক্ষায় থাকতে হল পাঠক-পাঠিকাকে।

গল্পলিখিয়ে সমরেশের দৌড় কিন্তু বাংলার ক্রান্তিকাল ১৯৬৭-তে, 'দেশ'-এ গল্প দিয়ে। আর ওই ১৯৭৭ অবধি গোটাকয়েক। কে জেনেছে? নামের দৌড় যাকে বলে তা শুরু হতে দ্বিতীয় উপন্যাস 'দৌড়'-এর সিনেমা হতে লাগল আরও দু'বছর।

কিন্তু তখনও ইনকাম ট্যাক্সের কেরানি সমরেশের এক ডাকের সমরেশ মজুমদার হয়ে উঠতে লাগল আরও ক'টা বছর। সেটা হয়ে গেল 'দেশ'-এ পঞ্চাশ কিস্তিতে 'উত্তরাধিকার' উপন্যাস ধারাবাহিক বেরুতে। কিস্তিতে কিস্তিতে যেন টুকি দিয়ে মৃদু ঘোষণা, 'এই আমি এনু!'

এবং থেকেও গেলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তীতে জনপ্রিয়তম বাঙালি লেখক। এই বাংলায়, এবং ওই বাংলায়। মহিলাদের মধ্যেও ফ্যানশিপে এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়। কলকাতা ও ঢাকায় দু'জনারই আঁটঘাঁটি। সুনীল চলে যেতে সমরেশ ওই বাংলায় এখন একা কুম্ভ।

ইনকাম ট্যাক্স ছেড়ে সমরেশ একসময় টিভির জন্য ছবি বানানোর কাজে নেমেছিলেন। তদ্দিনে, বেশ কম বয়সেই, 'উত্তরাধিকার'-এর জন্য অকাদেমি পুরস্কারও পাওয়া হয়ে গেছে। লেখা হয়েছে ক্রমে ক্রমে সে-নভেলের দুর্দান্ত দুই সিকুয়েল—'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ'।

তার পর কত যে জল গড়িয়ে গেল গঙ্গা এবং পদ্মায়। বিনি সুতোয় দেশ-দুনিয়া ঘুরে বেড়ালেন উত্তরবঙ্গের নদীছোঁয়া, কাঁকড়া-গুগলি ভরাট বালিয়াড়ি-ঘেঁষা গ্রামের ছেলে। দেখা হল লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলম্বাস। পাড়ি দেওয়া হল সুদূর, শীতল আইসল্যান্ড। লেখা হল অজস্র গল্প, উপন্যাস, ফিচার। এবং, দীর্ঘকাল ধরে, চলচ্চিত্র সমালোচনা। আর এরই মধ্যে একসময় প্রায় ঠিকই করে ফেলা হল যে লেখালিখিতে ইস্তফা দিয়ে দেবেন।

দেননি যে, সেটাও ভাগ্য।

ভাগ্য নিয়ে অবিশ্যি বরাবরের খেলাধুলো 'দৌড়'-এর লেখকের।

ঘোড়দৌড়ে দিব্য নেশা সমরেশের; হারেন, জেতেন, আবার হারেন... এ ভাবেই চলে।

ভাগ্যটা সাথ দিচ্ছে না বছরকয়েক। একবার পা ভাঙলেন, ঠেলেও উঠলেন। তার পর হঠাৎ একদিন স্ট্রোক হল। প্রাণটা বাঁচল, কিন্তু মগজটা প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। নতুন করে কাঁপা কাঁপা আঙুলে অ আ ক খ লিখতে হচ্ছিল 'কালবেলা'-র লেখককে এই অবেলায়।

দোষে দোষে সমরেশ। যেমন পান তেমনই ধূমপান। বুকের ধাক্কা প্রায় হাতে ধরে আনা। এখন সব চুকেবুকে গেছে। তবু মন চলে যায় কফিহাউস, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে। মদ না ছুঁয়েও আড্ডায় বসেন ক্লাবে হপ্তায় তিন দিন।

এ রকমই এক বিকেলের চায়ে বসা গেল 'মুক্তবন্ধ' টেলিসিরিয়ালের চিত্রনাট্যকারকে নিয়ে এক মুক্তবন্ধ আলাপে।

তোমার তো আজ পঁচাত্তর হল?
আর বোলো না। ভাবতেই অবাক লাগছে!

ভয় লাগছে?
ভাবতেই পারি না পঁচাত্তর বছর বেঁচে আছি পৃথিবীতে!

তা হলে জিজ্ঞেস করি, তোমার নিজেকে কি পঁচাত্তর বছরের বুড়ো, নাকি পঁচাত্তর বছরের যুবা মনে হয়?
আমার পঁচাত্তর বছর মনেই হয় না। আজকেই একটি মেয়ে এসেছিল বাংলাদেশ থেকে। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। আমি যে ভাবে তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও ঠিক সে ভাবেই কথা বলতাম। তা হলে আমার বয়সটা কী করে বেড়ে গেল বুঝলাম না আমি!

তার মানে তুমি নিজেকে পঁচাত্তর বছরের যুবা হিসেবে দেখতে পারো?
সেটা বললে অনেকের হজম করতে অসুবিধা হবে! সত্তর-পঁচাত্তর এই যে-সময়টা, তার মধ্যে মানুষ যত অসুখ আহরণ করা শুরু করে। সেই অসুখগুলো এত ছোবল মারে! তখন কেউ যদি নিজেকে পঁচাত্তর বছরের যুবা বলে জাহির করে, সে ঈর্ষার পাত্র হয়। কী দরকার মানুষকে ঈর্ষান্বিত করার!

সৌমিত্রদাকে দ্যাখো, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে এত শরীর খারাপও রয়েছে; কিন্তু ওঁকে বয়স্ক লোক বলে সে ভাবে মনে হয় না।
আমার বারবার মনে হয়, আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে সৌমিত্রদার এ ব্যাপারে—সৌমিত্রদা ওটা অভিনয় করেন!

তোমার এখন লেখার টাইমিংটা কী রকম? কখন লেখো?
গত দু'বছর ধরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। লিখতে ইচ্ছে করে না। আগে যেমন না-লিখে থাকতে পারতাম না, এখন তেমন পড়তে ইচ্ছে করে। লিখতে ইচ্ছে করে না। মাথায় একটা উপন্যাসের কথা পাক খায় বহুদিন ধরে। কুড়ি বছর বা তারও বেশি দিন হবে, এখনও হল না লেখা!

বিষয়টা কী?
এই যে ১৯৪৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সূচনা, দেশভাগ, তখন একসময় যারা ব্রিটিশদের তোষামোদ করেছিল, সেই মুসলিম লিগ ক্ষমতায় এল। তুমি যদি বাংলাদেশ যাও, লক্ষ করবে সেখানকার ২% মানুষের গায়ের রং সাহেবদের মতো ফরসা। এই যে-মানুষগুলো, তাদের বেসিকালি কোস্টাল এরিয়ায় বাড়ি। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই সব এলাকায় বিদেশি জাহাজ আসত, এদের পূর্বপুরুষরা তাদেরই সন্তান। এরাই মুসলিম লিগ করেছিল। এই মুসলিম শাসনটা বাংলাদেশে চলল ১৯৫৭-'৫৮ অবধি। ১৯৫২-তেই ওদের আন্দোলনটা শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনটাও সেই সময়ে হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত এই সময়টা বড় অদ্ভুত মায়াময় একটা পিরিয়ড বাংলাদেশে। মানে এই উত্থান-পতনের ব্যাপারটা। এর পর '৫৮ থেকে '৭১। এবং তার পর বাংলাদেশ। এই তিন পর্ব নিয়ে আমার একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে ছিল তিন খণ্ডে। এটা লেখার জন্য অনেক পড়তে হবে, অনেক রিসার্চ করতে হবে। এই কুড়ি বছর ধরে সেটা করা হয়নি। এত বড় লেখা!

এটা তোমার মাথায় এসেছিল কখন? কোন সালে?
মাথায় এসেছিল '৯৫-'৯৬ সালে। কিন্তু লিখতে সাহস পেতাম না। বারবার ঢাকায় গেছি, চট্টগ্রামে গেছি, মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছি। দেশভাগের পরে এ দেশে যারা পালিয়ে এসেছে, যারা থেকে গেছে ও দেশে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি।

তুমি এতদিন না-লিখে থাকলে কী করে?
আরও, আরও রসদ চাই। ভয় পাচ্ছিলাম। এটা তো বানিয়ে লেখার গল্প নয়।

কিন্তু অন্য লেখা যখন লিখেছ, তখন মনে হয়নি এই লেখাটাকেই লিখে ফেলা যায়?
সেটা ফাঁকিবাজি হত। ধরো, পুজোর উপন্যাস। তার স্প্যানটা অনেক ছোট। তাতে এটা লেখা যায় না।

এ বারে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি যখন প্রথম লেখা লিখলে, আমার মনে আছে—'এই আমি রেণু', ১৯৭৭-এর আনন্দলোক পুজোসংখ্যায়। তার পরে, আস্তে-আস্তে তোমার লেখার জনপ্রিয়তা বাড়ল। সেই সময় তোমার মধ্যে একটা সাংঘাতিক উদ্দীপনা ছিল।
'৬৭ সালে প্রথম গল্প। তার পর '৭৫ অবধি লেখক হওয়ার কোনও বাসনাই ছিল না আমার। বছরে দুটো-তিনটে গল্প লিখব, পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা করে পাব প্রত্যেকটা গল্পে। কফিহাউসে গিয়ে কফি-টফি খেতে পারব, এ রকম একটা ব্যাপার ছিল। '৭৫ সালে 'দৌড়' লিখলাম। লেখার পর লোকে ভাল বলতে লাগল। আমার তখন মনে হল, তা হলে আমি লেখক হতে পারি। তার পর আমাকে আনন্দলোক-এ লিখতে বলা হল। আনন্দলোকে লিখে হয়তো মনের মতো সাহিত্য পাঠক পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক টাকা পাওয়া যায়। লিখতে লাগলাম তাই। এই করতে-করতে সাগরবাবু আমায় দেশ-এ ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বললেন। এখনও মনে আছে, আমি যখন ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রস্তাব পেলাম, তখন তীব্র আপত্তি করেছিলাম। অত বড় লেখা! বলেছিলাম, আমি পারব না।

> তখনও আমি অকাদেমি পাইনি। সন্তোষদার ঘরে বসেছি। সঞ্জীব তখন সদ্য চাকরি পেয়েছে। ও সন্তোষদার ঘরে এসে নক করল। সন্তোষদা বললেন, "কী?" সঞ্জীব বলল, "আসব?" সন্তোষদা বললেন, "না, ব্যস্ত আছি।" সঞ্জীব ফিরে গেল। আমার একটা শিরশিরে অনুভূতি হল শরীরে। আমি যখন 'সন্তোষদা, আসব?' বললাম, তখন সন্তোষদা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ এসো।" আর সঞ্জীব যখন বলল, তখন বললেন, "না, ব্যস্ত আছি।" আমি বুঝলাম, আমি যদি চাকরি করি, তা হলে আমাকেও বলবেন, "ব্যস্ত আছি।"

তুমি পঞ্চাশ কিস্তি লিখেছিলে 'উত্তরাধিকার', আমার মনে আছে।
হ্যাঁ, আমি ঋণী ওঁর কাছে এই ব্যাপারে। আমাকে উনি জোর করে লিখিয়েছিলেন। 'উত্তরাধিকার' লিখতে-লিখতে আমি দেখলাম মানুষের আমার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

আমি একটা ছোট্ট ঘটনা তোমাকে মনে করিয়ে দিই। তা হলে তোমার অবজার্ভেশনটা পাব। আমি, সুনীলদা তখন আনন্দবাজারে এক ঘরে বসে কাজ করি। সেই সময় একদিন তুমি এসেছিলে ওই ঘরে। বোধহয় অরুণ বাগচী বা কাউকে খুঁজতে। তুমি বললে সুনীলদাকে, "আপনি একটা গল্পের সংকলন করছেন, তাই না?" সুনীলদা বললেন, "হ্যাঁ, করছি।" তুমি বললে, "আপনি তো আমার গল্প চাইলেন না!" উনি বললেন, "তাই? চাইনি বুঝি? আচ্ছা, যাকগে, এর পরে যদি আবার ভলিউম হয়, নিশ্চয়ই চাইব।" তখন তুমি বললে, "আমার এটা মনে লেগেছে, আপনাকে বলে দিলাম।"
ছেলেমানুষি!

কিন্তু এই যে-অভিমানটা নিজের গল্প সম্পর্কে, এটা কি তোমার সেই দেশ-এ লেখা বেরনোর পর থেকেই তৈরি হয়েছে, নাকি আস্তে-আস্তে তৈরি হয়েছে?
আসলে ওই সময়টা ছিল ঔদ্ধত্যের সময়। উদ্ধত কথাবার্তা বলতে আমরা দ্বিধা করতাম না। 'উত্তারাধিকার', 'কালবেলা' হয়ে যাবার পর আমি আর ওই রকম কথাবার্তা বলতামই না। কিন্তু তার আগে মনে হত আমাকে অবহেলা করবে কেন? দ্যাখো, তুমি যখন উপন্যাস লিখলে, আমরা কফিহাউসের টেবিল চাপড়াতাম। আমরা তখন কোনও গ্রুপে তো বিলং করতাম না। যার যেটা ভাল সেটা ভাল, যেটা খারাপ সেটা খারাপ— এ রকম একটা ব্যাপার ছিল। আমরা তখন তোমাকে নিয়ে বলতাম ওর এত ফিচার না-লিখে গল্প-উপন্যাসে মন দিলেই ভাল হয়।

তুমি আর একটা কথা বলেছিলে। আজ থেকে বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে। খুব ইন্টারেস্টিং কথা। খবরের কাগজ থেকে, ওই পয়লা বৈশাখ বা ও রকম কোনও একটা বিশেষ সংখ্যার সময়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আবার পিছনে তাকালে কী মনে হয়? এই যে এখন এত খ্যাতি হয়েছে, কী মনে হয় পিছনে তাকালে? না-পাওয়াটা কী? তখন তুমি বলেছিলে যে আজকে যে-খ্যাতি বা সমাদর পাচ্ছি, সেটা যদি আমি কুড়ি বছর আগে পেতাম, তা হলে পিছনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।
'৬৫-'৬৬ সালে 'আত্মপ্রকাশ' বেরিয়েছিল, সুনীলদার। এবং সেই বছরেই সুনীলদা সুনীল গাঙ্গুলি হয়ে ওঠেন। তার পরের বছর বেরোয় শীর্ষেন্দু মুখার্জির 'ঘুণপোকা'। কিন্তু তাতে শীর্ষেন্দুদা সেই জায়গাটায় পৌঁছতে পারল না যেটা সুনীলদা পেরেছিলেন। তার পর বরেন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন। বরেনদা তো পারলেনই না। সুনীলদা যেটা পেয়েছিলেন ওই বয়সে, আমরা সেটা পাইনি। সুনীলদা সেই অর্থে অনেক লাকি ছিলেন।

কিন্তু, তোমার 'দৌড়' বেরোবার পরেই তো সেটা ছবি হয়েছিল।
'দৌড়'১৯৭৫-এ বেরিয়েছিল। ছবি হল সেটা '৭৯-'৮০-তে। এই চার বছরের মধ্যে লোকে আমাকে ভুলে গেল। 'দৌড়'-এর পর আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্সে গেলাম। বাদলবাবুর আগে তখন যিনি ছিলেন আনন্দে, দেববাবু, তাঁকে বললাম, আমার উপন্যাস দেশ-এ বেরিয়েছে। উনি বললেন, "আমি কী করব?" বললাম, যদি ছাপেন এই বইটা। বললেন, "রেখে দিয়ে যান, পাঁচ বছর বাদে এসে খবর নেবেন।" এত রাগ হল! আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। সেটা মিত্র ও ঘোষ পরে ছাপল। আনন্দবাজারে চাকরি পাওয়া যায় জানতাম। আমার তখন একটা চাকরি দরকার। কিন্তু আমাকে কেউ চাকরির কথা বলে না। আমি একদিন সন্তোষদাকে ফোন করে বললাম, সন্তোষদা, আমার একটা চাকরির দরকার।

তখন তুমি ইনকাম ট্যাক্সে কাজ করো না?
না। ইনকাম ট্যাক্সে যখন চাকরি করতাম, তখন আমার মাইনেও খুব বেশি ছিল না। তো, তখনও আমি অকাদেমি পাইনি। সন্তোষদার ঘরে বসেছি। সঞ্জীব তখন সদ্য চাকরি পেয়েছে। ও সন্তোষদার ঘরে এসে নক করল। সন্তোষদা বললেন, "কী?" সঞ্জীব বলল, "আসব?" সন্তোষদা বললেন, "না, ব্যস্ত আছি।" সঞ্জীব ফিরে গেল। আমার একটা শিরশিরে অনুভূতি হল শরীরে। আমি যখন 'সন্তোষদা, আসব?' বললাম, তখন সন্তোষদা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ এসো।" আর সঞ্জীব যখন বলল, তখন বললেন, "না, ব্যস্ত আছি।" আমি বুঝলাম, আমি যদি চাকরি করি, তা হলে আমাকেও বলবেন, "ব্যস্ত আছি।" তখন মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। সন্তোষদাকে তাই বললাম, আমি একটু আসছি। উনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরে এসো।" আর যাইনি!

আটের পাতায় »